সংবাদ পরিষেবা | অগাষ্ট ২০২১

কৃষি, স্বাস্থ্য, পরিবেশ ও বাস্তুবিদ্যা বিষয়ক, এই তথ্য-মাসিক কোনো সংবাদপত্র নয়, বরং সংবাদ বিনিময়-পত্র। এই বিনিময়-প্রয়াসে যুক্ত বাংলা-আসাম-ত্রিপুরা-বাংলাদেশ সহ বঙ্গভাষী বৃত্তের বিবিধ আঞ্চলিক সংবাদ-সাময়িকী।

খিদে আর অপুষ্টির লকডাউন ২৭/১০

মানুষ প্রধানমন্ত্রী গরীব কল্যাণ অন্ন যোজনার আওতায় বিনামূল্যে রেশন পাচ্ছে। নিচ্ছেও। ফলে কোনো মানুষ এখন অভুক্ত থাকে না। গর্ব ভরে সরকার বলছে। তবে সত্যিটা হল দেশে খাবারের অভাব রয়েছে। সরকার তাই দিচ্ছে। মানুষ নিচ্ছে। ২০২১-এর এপ্রিলে 'হাঙ্গার ওয়াচ' এর রিপোর্টে বলা হয়েছে, লকডাউনের পরে কাজ হারিয়ে ৩৯ শতাংশ মানুষ কোনো খাবারই জোটাতে পারছে না। ৫৮ শতাংশ মানুষ থাকছেন একবেলা অভুক্ত। ৫৫ শতাংশ মানুষ রাতের খাবার না খেয়েই ঘুমোতে যাচ্ছেন। লকডাউনের পর, ৯১ শতাংশ রোজগারহীনের পাতে একটা ডিমও জুটছে না।

স্কুল চালু থাকলেও বাচ্চাদের রান্না করা খাবারে খাদ্য এবং পুষ্টির ঘাটতি সামান্য হলেও মিটত। এতে সামান্য পয়সা বাঁচত। পরিবারগুলির খাবার বা অন্য দরকারি সামগ্রীর কেনার জন্য যা ব্যবহার করা যেত। কিন্তু তা তো হওয়ার নয়। সিনেমা হল খুলবে। স্কুল খুলবে না।

সরকারের সাম্প্রতিক হিসেব অনুযায়ী, ভারতের ৩৮ শতাংশ শিশু 'স্টান্টেড' (পাঁচ বছরের কমবয়সী শিশুর বয়সের সাপেক্ষে উচ্চতা কম), এবং ২১ শতাংশ 'ওয়েস্টেড' (পাঁচ বছরের কমবয়সী শিশুর উচ্চতার সাপেক্ষে ওজন কম)। ৫ বছরের নীচে অপুষ্টিতে মৃত্যুহার ভারতে ৬৮ শতাংশ, কোভিডে ০.২৬ শতাংশ। কিন্তু কে শোনে কার কথা!!

খাদ্য, অপুষ্টি ২৭/১১

খাদ্য প্রক্রিয়াকরণে কাজের সুযোগ

খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ মন্ত্রকের নিয়ন্ত্রেণে দেশে দুটি জাতীয় খাদ্য প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এগুলি হল হরিয়ানার কুন্ডলীতে ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অফ ফুড টেকনোলজি এন্টারপ্রেনারশিপ অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট (এনআইএফটিইএম) এবং তামিলনাড়ুর থাঞ্জাভুরে ইন্সটিটিউট অফ ফুড প্রসেসিং টেকনোলজি (আইআইএফপিটি)। খাদ্য প্রযুক্তি এবং অনুসারি শিল্পের জন্য এনআইএফটিইএম ১২টি এবং আইআইএফপিটি ৬টি পাঠক্রমের ব্যবস্থা করেছে। দেশে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে মানব সম্পদের চাহিদা বাড়ায় এই দুটি প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিষয়ে আসন সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। উল্লেখ্য ২০১৫-১৬,২০১৬-১৭ এবং ২০১৭-১৮ অর্থবর্ষে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে কমসংস্থান বৃদ্ধি পেয়েছে বলে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ দফতরের প্রতিমন্ত্রী প্রহ্লাদ প্যাটেল লোকসভায় জানিয়েছেন। তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গে এই তিন বছরে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে যথাক্রমে ৮৯৪৯৭, ৯৮৩৯০ এবং ১০৯৮৬২। ত্রিপুরায় এই সময়কালে কর্মসংস্থান হয়েছে যথাক্রমে ২৩২৫, ২৫২৪ এবং ২৫০৯। তবে লকডাউন শুরুর সময় থেকে কোভিড এর দ্বিতীয় ঢেউ অবধি কোনো তথ্য মন্ত্রী জানাননি।

খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, কর্মসংস্থান ২৭/১২

ভূজল কমছে

সেন্ট্রাল গ্রাউন্ড ওয়াটার বোর্ড (সিজিডব্লুইবি) দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ভূগর্ভস্থ জলের স্তর পরিমাপের কাজ চালাচ্ছে। তাদের করা পর্যবেক্ষণের বিভিন্ন তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে, দেশের ৬৮ শতাংশ ভূগর্ভস্থ জল ৫ মিটার পর্যন্ত গভীরতায় রয়েছে। আবার কোথাও এই জলের অবস্থান ৪০ মিটারের বেশি গভীরতায়। কিন্তু দেশে মাটির নিচের জলের পরিমাণ কমছে। আর তাই সংরক্ষণ এবং জলের অপচয় রোধ করে জলের ব্যবহার সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করে তুলতে প্রচারও চলছে। এছাড়া সিজিডব্লইবি কৃত্রিম উপায়ে মাটির নিচের জলের পরিমাণ বাড়ানোর জন্য পরিকল্পনা করেছে। সিজিডব্লইবি তথ্য অনুযায়ী দেশে ২৫৬টি জল সঙ্কটপূর্ণ জেলার মাটির তলার জল বৃদ্ধিসহ জল সংরক্ষণের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। চলতি বছরের ২২মার্চ থেকে

৩০ নভেম্বর পর্যন্ত দেশের গ্রাম এবং শহরাঞ্চলের সমস্ত জেলায় বৃষ্টির জল সঞ্চয়ের ওপর জোর দিয়েছে জলশক্তি মন্ত্রক। লোকসভায় এক প্রশ্নের উত্তরে একথা জানিয়েছেন জলশক্তি মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী প্রহ্লাদ সিং প্যাটেল।

ভূজল সংরক্ষণ ২৭/১৩

পারমাণবিক বিদ্যুৎ বা এই শক্তি ব্যবহারের বিপদ সম্পর্কে আমরা কম বেশি জানি। বিভিন্ন দেশে এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। চেরনোবিল, হিরোসিমা, নাগাসাকি, ফুকুসিমার মতো বিপর্যয়ের পরে। অথচ এদেশের সরকার বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়াতে আরো পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র চালু করার পরিকল্পনা করেছে। লোকসভায় প্রশ্নের উত্তরে দফতরের মন্ত্রী জানিয়েছেন বর্তমানে ২২টি চুল্লি থেকে মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ৬ হাজার ৭৮০ মেগাওয়াট এবং কেএপিপি-৩ চুল্লি থেকে ৭০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়।

এছাড়াও, আরো ১০টি চুল্লি থেকে ৮ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদানের পরিকল্পনা রয়েছে। সরকার ইতিমধ্যেই ৭০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ১০টি হেভিওয়াটর রিঅ্যাক্টের নির্মাণে প্রশাসনিক ছাড়পত্র দিয়েছে। এই ১০টি হেভিওয়াটার রিঅ্যাক্টেরের নির্মাণ কাজ শেষ হলে দেশে ২০৩১ সাল নাগাদ পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা দাঁড়াবে ২২ হাজার ৪৮০ মেগাওয়াটে। ভবিষ্যতে এই ধরনের আরো বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে বলেও মন্ত্রী জানান।

পরমাণু শক্তি, বিদ্যুৎ, বিপর্যয় ২৭/১৪

জৈবসারের প্রসার

পরম্পরাগত কৃষি বিকাশ যোজনা (পিকেভিওয়াই) ২০১৫- ১৬ থেকে রূপায়িত হচ্ছে। ভারত সরকার এই কর্মসূচির মাধ্যমে সারা দেশে রাসায়নিক উপাদান মুক্ত জৈব চাষাবাদ পদ্ধতির প্রসারে কাজ করে চলেছে। এর আওতায় জৈব চাষাবাদের জন্য চাষিদের নিয়ে ক্লাস্টার গড়ে তোলা হচ্ছে। এ ধরনের চাষাবাদের জন্য দক্ষতা বৃদ্ধি, উৎসাহ ভাতা, উৎপাদিত ফসলে মূল্যযোগ এবং বিপণনে হেক্টর প্রতি তিন বছরে ৫০ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়।

এই সহায়তার মধ্যে ৩১ হাজার টাকা দেওয়া হয় জৈবসার, কীটরোধক, বীজ প্রভৃতি খাতে। ফসল উৎপাদনের পর তার বিপনন ও মূল্যযোগ খাতে হেক্টর প্রতি তিন বছরে ৮,৮০০ টাকা দেওয়া হয়ে থাকে। গত চার বছরে এই কর্মসূচির আওতায় রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে ১,২৯৭ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও, প্রতি ২০ হেক্টরে একটি করে জৈব ক্লাস্টার গঠনের জন্য এবং দক্ষতা বৃদ্ধি খাতে তিন বছরে হেক্টর প্রতি ৩ হাজার টাকা দেওয়া হচ্ছে। রাজ্যসভায় এই তথ্য দেন কৃষি ও কৃষককল্যাণ মন্ত্রী শ্রী নেরেন্দ্র সিং তোমর।

উত্তরাখণ্ড থেকে এই প্রথম জৈব সবজি সংযুক্ত আরব আমিরশাহীতে রফতানি করা হয়েছে। হরিদ্বারের চাষিদের উৎপাদিত কারিপাতা, ঢেঁড়স, ন্যাশপাতি এবং করলা দুবাইতে পাঠানো হয়েছে। এর আগে ২০২১ সালের মে মাসে উত্তরখণ্ড থেকে সংগ্রহ করা বাজরা ডেকমার্কে পাঠানো হয়েছিল। কৃষি ও প্রক্রিয়াজাত খাদ্য রফতানি উন্নয়ন সংস্থা, অ্যাপেডা ও উত্তরখণ্ডের কৃষি উৎপাদন বিপণর পর্ষদ, ইউকেএপিএমবি ওই রফতানির ব্যবস্থা করেছে। উত্তরখণ্ড সরকার জৈব পদ্ধতিতে চাষ করার জন্য গুরুত্ব আরোপ করেছে। এ বিষয়ে কয়েক হাজার চাষিকে জৈব শংসাপত্র দেওয়া হচ্ছে।

উল্লেখ্য ২০২০-২১ অর্থবছরে ভারত থেকে ১১ হাজার ৩১৯ কোটি টাকার ফল এবং সবজি রফতানি করা হয়েছে, যা ২০১৯০২০ অর্থবছরের চেয়ে ৯ শতাংশ বেশি। অ্যাপেডা রফতানির ক্ষেত্রে দক্ষতা গড়ে তোলার পাশাপাশি বিপণন এবং উচ্চমানের প্যাকেজিং করার বিষয়টির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে।

জৈবচাষ,ব্যবসা ২৭/১৫

প্লাস্টিক পথ

এ পর্যন্ত দেশে ৭০৩ কিলোমিটার জাতীয় সড়ক নির্মাণে বর্জ্য প্লাস্টিক ব্যবহার করা হয়েছে। সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক মন্ত্রক এই মর্মে যে নীতি-নির্দেশিকা জারি করেছে, তাতে বলা হয়েছে, যেসব শহরের জনসংখ্যা ৫ লক্ষেরও বেশি, এই শহরগুলির ৫০ কিলোমিটার এলাকার বর্জ্য প্লাস্টিক ব্যবহার করে সড়ক নির্মাণ বাধ্যতামূলক। এক্ষেত্রে প্লাস্টিক ও হটমিক্সের মিশ্রণ দিয়ে রাস্তা

তৈরির কাজ করতে হয়। এর ফলে, বর্জ্য প্লাস্টিকের কারণে পরিমেশ দূষণের সমস্যা কম হবে।

পরিবেশ, লাগসই প্রযুক্তি

কৃষি আইন, চাষিদের সংস্থা আর লুঠ

সুব্রত কুণ্ডু

কৃষি আইন বাতিল করতে হবে। যুক্তিযুক্ত দাবী। আর্থিকভাবে দূর্বল ছোট এবং প্রান্তিক চাষি। তাদের শেষ জীবিকাটুকু কেড়ে নিতে চায় সরকার। একাজে তার দোসর কর্পোরেট। তিনটি কৃষি আইন হাতিয়ার করে। সব সরকারই চায় কৃষি থেকে হাত তুলে নিতে। এতে ভরতুকি কম দিতে হয়। দায়ও কমে। কর্পোরেট চায় হাতে তুলে নিতে। কারণ নানা খাতে প্রচুর ভরতুকি বাড়ে। সরকার কম সুদে প্রচুর ঋণ দেয়। সরকারি ঋণ শোধ না করলে ক্ষতি নেই। ব্যাংক খাতায় 'বাজে ঋণ' বলে তা লেখা যায়।। পরে তা বাতিলের খাতায় চলে যায়। সব মিলিয়ে একচেটিয়া ব্যবসাও বাড়ে। বিভিন্ন দেশে এ ঘটনাই ঘটছে। এসবের মধ্যে চাষি কার্যত বড় কৃষি ব্যবসার শ্রমিক হয়ে পড়ে। তাই তিনটি কৃষি আইন নিয়ে এত বিরোধ।

কৃষির কর্পোরেটকরণের আরেক হাতিয়ার হল চাষিদের কোম্পানি তৈরি। এর পোশাকি নাম ফার্মার প্রোড্যুসার অর্গানাইজেশন বা এফপিও। কেন্দ্র সরকার আর নাবার্ড উঠে পড়ে লেগেছে এফপিও তৈরিতে। রাজ্যও পিছিয়ে নেই।আইন শুধরে নেওয়া হয়েছে। কিছু এনজিও আর অসরকারি সংস্থা এর প্রোমোটার। বিশ্বব্যাংক তাদের নিজস্ব এই মডেল পয়সা চালাচ্ছে। পয়সা ঢালছে এনজিওদের দাতা সংস্থাগুলিও। উদ্দেশ্য নাকি চাষিদের সংগঠিত করা। চাষের সামগ্রী এবং উৎপাদিত ফসল কেনাবেচার ক্ষেত্রে তাদর দরদাম করার ক্ষমতা বাড়ানো। ধরে নেওয়া হচ্ছে, এতে চাষির শক্তি এবং আয় দুইই বাড়বে। আখেরে কি তাই হবে? মনে হয় না। এর মূল উদ্দেশ্য একদম অন্যরকম। এদেশে ক্ষুদ্র এবং প্রান্তিক চাষি ৮৬.২ শতাংশ। রাজ্যে ৯৬ শতাংশ। সমীক্ষা বলছে,সারা পৃথিবীতেই এই চাষিরা অন্যদের তুলনায় বেশি ফসল ফলায়। ভারতের চাষিএ এর ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু উৎপাদনশীলতা বেশি হলে কি হবে, এদের ঘরে ঘরে গিয়ে ফসল কেনা কর্পোরেটের পোষায় না। খরচ অনেক বাড়ে। তাই এফপিওর অছিলা। চাষিদের এক জায়গায় করে। হাজার চাষির ফসল এক জায়গা থেকে কেনো। চুক্তি করে কেনো। মুনাফা বাড়াও।

সবুজ বিপ্লবের সঙ্গে এসেছিল একক চাষ। দানা শস্যের ক্ষেত্রে এই একক চাষ সারাদেশে ছড়িয়েছে। আর কিছু এলাকায় জমি অনুযায়ী অন্য কিছু ফসলের একক চাষ হয়। অন্ধ্র ও তেলেঙ্গানায় তুলো, মহারাষ্ট্রে আখ আর পেঁয়াজ। আমাদের রাজ্যে আলু ইত্যাদি। কিন্তু এদেশের জল হাওয়ায় এত বৈচিত্রময় ফসল হয় তা সারা পৃথিবীতে কোথাও হয় না। এই বৈচিত্র প্রকৃতি য়-পরিবেশের জন্য জরুরি। আর বৈচিত্র্য টিকে আছে ছোট চাষিদের জন্যই। এগুলির চাহিদা স্থানীয়ভাবে আছে। তাই চাষি ফলায়। কিন্তু কর্পোরেট তো দশ রকম বেগুন, সাত রকমের সিম, পাঁচ রকমের লঙ্কা কিনবে না। তারা তো বিশ্ব বাজারে ফসল বেচতে চায়।

বৈচিত্র্য নিয়ে তারা কি করবে, বিশ্ব বাজারে তার যদি চাহিদা না থাকে। তারা জানে লঙ্কার থেকে রভবেরঙের ক্যাপসিকামের কাটতি অনেক বেশি। ছোট, বড়, মাঝারি জাতের টম্যাটো প্যাকিং করতে অসুবিধা। তাই লম্বা ও কিছুটা চৌকো মাপের, বীজ কম টম্যাটো চাই। এভাবেই একই মাপের আলু চাই-ইত্যাদি ইত্যাদি। তাই তারা জমি এবং জল শোধন করে ওইসব ফসল চাষ করতে চাষিদের ইনসেন্টিভ দেবে। বীজ, সার, বিষ নিজেরাই দেবে। এসব করা হবে এফপিওদের সঙ্গে চুক্তি করে। হাজার চাষির থেকে দুই একজন কর্তাকে বোঝানো সহজ। ঘুষ দেওয়াও সহজ। এতে মাটি, জল, পরিবেশ, বৈচিত্র্য চুলোয় গেলে যাক।

দুর্ভাগ্যের বিষয় হল, যারা কৃষি আইনের বিরোধ করছে, তারা এফপিও নিয়ে চুপ। কিছু সংস্থা তো এর প্রচারক, প্রসারক। তারা ভাবছে এতে চাষিদের সক্ষমতা বাড়বে। ঘোড়ার ডিম। সহজ সত্যি কথাটা হল, যেন তেন প্রকারেণ মুনাফাই কর্পোরেটের এক এবং অদ্বিতীয় লক্ষ্য। অন্য কিছু নয়, ভেবে দেখুন। উদাহরণ আশেপাশে অনেকই আছে...।

মতামত নিজস্ব
চাষ, এফপিও

সংবাদ সংগ্রহ ও প্রচারে সার্ভিস সেন্টার, ৫৮এ, ধর্মতলা রোড, বোসপুকুর, কসবা, কলকাতা - ৭০০ ০৪২ । দূরভাষ ২৪৪২ ৭৩১১, ২৪৪১ ১৬৪৬, গ্রাহক চাঁদা বার্ষিক ৫০ টাকা (সডাক)
সহযোগী সম্পাদনা ও হরফ বিন্যাস : শিপ্রা দাস, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, রূপায়ণ : অভিজিত দাস,
সম্পাদক : সুব্রত কুণ্ডু